নীলনদী লালপাহাড়

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়



নীল নদী লাল পাহাড়

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শিশুতীর্থ এডুকেশন ট্রাস্ট
১৪/২ ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া-২

প্রচ্ছদ শিল্পী : তপন চক্রবর্তী শ্যামলেন্দু মৈত্র
চিত্রকর : সুকুমার রায় এবং দিলীপ দাস

NIL NADI LAAL PAAHAAR
Collection of Socialist folktales
rendered in Bengali by
Sukha Ranjan Mukhopadhyay

3rd edition 1987 Calcutta Book Fair

প্রথম প্রকাশ ১৯৮১
পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭
প্রকাশক : শিশুতীর্থ এডুকেশন ট্রাস্ট
১৪/২ ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া-২

মুদ্রক : গীতা প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিটি
১৪৪/৮ ধর্মতলা রোড, শালকিয়া, হাওড়া-৬
দাম : ছয় টাকা

এখানে যে দশটি গল্প আছে তা ছোটদের তো বটেই, বড়দেরও সমান ভাল লাগবে। ছোটরা পাবে মজা ও কিছু নীতিশিক্ষা আর বড়রা পাবেন তাঁদের মতো করে গভীরতর কিছু তাৎপর্য।

গল্পগুলির অবলম্বন রুশ, চীন, বর্মা, ইংলণ্ড, ও ইন্দোনেশিয়ার লোককথা। তবে গল্পগুলির ভিতরের ছড়াগুলি যেমন লেখকের মৌলিক রচনা তেমনি গল্প বলা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল গল্পের সংস্কার ও রূপান্তর গল্পগুলিকে অনেকখানি মৌলিকতা দিয়েছে।

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গল্পগুলির নাম

ইঁদুরের বিয়ে

এক ইঁদুর ছিল। আর তার বউ ইঁদুরনী ছিল। আর তাদের এক ফুটফুটে মেয়ে ছিল।

দেখতে দেখতে মেয়ের বিয়ের বয়স হোল। ইঁদুর বাপমায়ের গায়ের রঙ কালো হলে কি হবে, তাদের মেয়ের রঙ একেবারে দুধে আলতায় ফর্সা হয়েছে। এমন রাজকন্যের মতো মেয়েকে তো আর যারতার সাথে বিয়ে দেয়া যায় না। এদিকে আবার মেয়ে বললে, দুনিয়ায় সব থেকে শক্তিমানকে ছাড়া সে বিয়েয় বসবে না। পুঁচকে বা ধেড়ে ইঁদুরদের সে আমলই দেয় না। ইঁদুর আর ইঁদুরনী তখন মেয়ের পাত্রের খোঁজে যাত্রা করল।



মাঠঘাট পেরিয়ে দুজনে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পথে পোকা-মাকড় সাপ ব্যাঙ পাখিটাখি যারই সাথে দেখা হয়, জিজ্ঞেস করে, 'দুনিয়ায় সব থেকে শক্তিমান কি বলতে পার?' সবাই যে যার মত একটা নাম করে। ইঁদুর ইঁদুরনীর মনোমত হয় না।

মাথার ওপর সূর্যটা গনগন করছে। সকালে আকাশ-মাটির সীমানা থেকে যখন উঠতে দেখেছে, তখন সূর্যটাকে কি সুন্দর না দেখিয়েছে। এখন সেই সুন্দরই কি ভীষণ শক্তিধর হয়েছে,… ইঁদুরনী বললে ইঁদুরকে—'এই হোল বিশ্বের সেরা শক্তিধর…এর মতো কেউ নয়। এই সূর্যই হোল আমাদের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র।'

ইঁদুর বলল, 'ঠিক বলেছ।'

তখন দুজনে নতজানু হয়ে সূর্যের বন্দনা করতে বসল ঃ

সূয্যি ঠাকুর, নমস্কার
দাও আমাদের পুরস্কার
তোমার চেয়ে শক্তিধর
তিন ভুবনে নেইকো আর
হও আমাদের মেয়ের বর
শ্রীচরণে নমস্কার
ধন্য তোমার পুণ্য নাম
পূরণ কর মনস্কাম।

সূর্যদেব তখন পাটে নামছেন। প্রার্থনা শুনে হেসে বললেন,—'আপনাদের ভুল হচ্ছে। আমার চেয়ে শক্তিমান হলেন বাতাস। দেখেন নি, বায়ু রাগলে ঝড় উঠে? ঝড়ের চেয়ে শক্তিমান কেউ হয় না। ঝড় রাশি রাশি মেঘ এনে আমাকে ঢেকে দেয়। তাছাড়া সূর্যগ্রহণেও তো আমি ঢাকা পড়ি। তাহলে আর আমি সব থেকে শক্তিমান হলাম কি করে? আপনারা বরং ঝড়ের কাছে যান।"

ইঁদুর ইঁদুরনী তখন করযোড়ে বাতাসের খোসামোদ শুরু করল—

ওগো বাতাস ওগো বায়ু
ওগো সবার পরমায়ু
সমীর, পবন, মলয়
শতেক নামের বলয়

তোমায় আছে ঘিরে
ওগো হাওয়া, বহ ধীরে।
প্রভু তোমার জন্যে
এনেছি রাজকন্যে
হয়ত বা নগণ্য
কর মোদের ধন্য !

মর্মর সুরে যেতে যেতে সমীরণ বলে গেল—আপনাদের বন্দনা শুনতে আমার ভালই লাগল। তবে কি জানেন, আমার থেকে শক্তিমান হল পাহাড়। হাজার ঝড়েও আমি একটা পাহাড় উপড়ে নিয়ে কোথাও ফেলতে পারি না। আপনারা বরং ঐ পাহাড়কেই পাত্র করুন।'

করুণ মুখে ইঁদুর দম্পতি এল এক মস্ত পাহাড়ের কোলে। পাহাড়েব মন পেতে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে প্রার্থনা শুরু করল—

পাহাড় আহা পাহাড়
চোখ জুড়ানো বাহার
আকাশ ছোঁয়া মাথা দেখে
যাই ভুলে স্নান আহার
হোক না ও বুক পাথর
ঝর্ণা নদীর আতর
ওখান থেকেই পড়ছে ঝরে
এমন শক্তি কাহার ?
পাহাড় ওগো পাহাড়
তোমার অসীম দয়া
কন্যা মোদের পয়া
তোমায় দিলে মালা
জুড়ায় মোদের জ্বালা।

পাহাড় কিন্তু এত তোয়াজেও ছিটেফোঁটা গলল না।

ভূমিকম্পের মতো আওয়াজ করে বলল—যত সব বাজে কথা। আমার কি এমন ক্ষমতা? নড়তে চড়তেই যে পারে না, তার আবার শক্তি! আমার থেকে ঢের শক্তিমান "হোল বলবান জানোয়াররা…বিশেষত ঐ হাতী ঘোড়া সম্বর ষাঁড়টাঁড় …. আপনারা বরং ষণ্ডকে জামাই করুন।"

হতাশ ইঁদুর ইঁদুরনী ষণ্ডের খোঁজে চলল। পেয়েও গেল মাঠের পাশে। তাড়াতাড়ি আর্জি পেশ করল—

শিব ঠাকুরের বাহন বাবা
মহাবীর ষাঁড়
শিংএর গুতোয় গুড়িয়ে ফেল
পাহাড়টারও হাড়
তোমার সেবা করবে কে বা
আমার কন্যে বিনে
সাত কাহনে জামাই করে
নেবই তোমায় কিনে

ইঁদুর পিতামাতা গলবস্ত্র হয়ে আরও অনেক গুণগান করতে যাচ্ছিল। তবে তার আগেই গাঁক গাঁক করে বাধা দিয়ে ষাঁড় বলে উঠলেন—চুপ চুপ! একদম মন রাখা কথা নয়। কে বললে আমি এত শক্তিমান? হাতী ঘোড়া বাঘ সিংহ এমন কি ভগবানও সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান নয়।

—'তা হলে কে সর্বশক্তিমান' হুজুর দয়া করে আপনিই আমাদের তা বলে দিন'—দম্পতির প্রার্থনা।

ষণ্ড বললেন,—দড়ি, একগাছা দড়ি, ভাল কথায় যার নাম রশি, রজ্জু হাঁ.. দড়িই হল সংসারে সর্বশক্তিমান ..

ইঁদুর দম্পতির বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে ষণ্ড বলতে লাগলেন—দড়ি দিয়েই মানুষ আমাদের মতো শক্তিমানদের বেঁধে রাখে, নাকে দড়ি দিয়ে খাটায়। তাই বলছিলাম, তোমরা মেয়ের গলায় দড়িই দাও, সেই হবে তোমাদের উপযুক্ত পাত্র। মানুষের বিয়েতে যে

মালা বদল হয়, সেও ফুলে ঢাকা এক গাছা দড়ি বৈত নয়।

ইঁদুরনী মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলল—আজ্ঞে, সেটা দড়ি নয়, সুতো।

বাধা দিতে ভয়ানক রেগে ষণ্ড বলল—আমার কথার ওপরে কথা? মূর্খ কাঁহাকা। সুতো আর দড়ি কি আলাদা? রোগা লোক আর মোটা লোকে তফাৎ কি?

রাগে গরগর করতে করতে ষাঁড় চলে গেলেন। তখন ইঁদুরনীর মনে পড়ল, ঠিকই তো, দড়ির মাহাত্ম্য তো কম নয়! মানুষের বাচ্চাদের কোমরে দড়ি থাকে। অনেক লোক ঘটা করে গলায় দড়ি দেয়। তাকে আবার আদর করে বলে পৈতা! ঠিক আছে। তাহলে মেয়ের গলায় দড়িই দেবে, দড়িকেই জামাই করবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দড়ির সামনে নতজানু হয়ে দম্পতি প্রার্থনা জানাল—

সুতো কিংবা দড়ি
ধন্যি কারিগরি
পরনও হয়, মরণও হয়
বিয়ের কণের বরণও হয়
নাকে দড়ি ভালুক নাচাও
ঝড় তুফানে জাহাজ বাঁচাও
সত্যি তোমার নেই তুলনা
কন্যে নিতে হেই ভুল না।

দড়ি দুলে দুলে জবাব দিল—দেখ হে, আমার সম্পর্কে যা বললে তা অবশ্য ঠিকই আছে. তবে কি জান, আমি জাহাজই বাঁধি আর গলায় ফাঁসিই দিই কণের গলায় মালা হই আর জামা বানাই, ইঁদুরের কাছে আমার কোনো জারিজুরিই টেকে না। যত

মোটাই আমি হই না কেন, নেংটির শানান দাঁতে আমার জান খতম হবেই। ভেবে দেখ, আমাকে মেয়ে দিয়ে শেষে নিজেরাই মেয়েকে বিধবা করবে কি না।

ইঁদুর বাপ মা তাড়াতাড়ি বলল—না, না, তা কি হয়! তাহলে আপনিই দয়া করে একটা পাত্রের সন্ধান দিয়ে আমাদের কন্যাদায়মুক্ত করুন প্রভু!

দড়ি বলল স্বজাতে স্বদেশেই মেয়ে বিয়ে দিতে হয়। ভূভারতে ইঁদুরের থেকে শক্তিমান জীব আর একটি পাবে না। যাও, ঘরে ফিরে একটি ইঁদুর সুপাত্র দেখে মেয়ে বিয়ে দাও গে।

অনেক অনেক পথ ঘুরে ইঁদুর ইঁদুরনী দেশে ফিরল। একটি সুপাত্রও মিলল। শুভদিন দেখে বসল বিয়ের আসর। ছুঁচো বসল পুরুত হয়ে। নেংটি, ধেড়ে, গেছো, সব জাতের ইঁদুরের সমাবেশে ইঁদুরীর বিয়ে হয়ে গেল। বাসরঘরে কিশোরী ও তরুণী ইঁদুররা গান গাইল—

ও সখি তোর কেমন বর বর বটে তার নেইক ঘর
মাথায় যে ভাই বেজায় ফাঁক ঠুক্‌রে কে ওর করল টাক

টাক ঢেকে দে টোপরে লেজ বুঝি ওই ওপরে
টিকির মতো হিঁদুদের গোঁফটি বটে ইঁদুরের
ও সখি তোর কপাল জোর সিঁথিতে দাগ সিঁদুরের
থাকুক তোমার জীবনভোর খুদ জুটবে বিদুরের।

নেংটি বরের কানটি ধর যার যা খুসি সে তাই কর।
কিচির মিচির কিচির কিচ্ চিকির মিচির ফিকির ফিচ



নীল নদী লাল পাহাড়



এক বছর বয়স হতে না হতেই বদ্রি পাখিদের বড় ছেলে পার্ল বেজায় লায়েক হয়ে উঠেছে। বাড়ির কাউকে তোয়াক্কা না করে সে তার ভালবাসার পাখি মেয়েটাকে বিয়ে করে বসেছে। বউকে আদর করে নাম দিয়েছে পার্লি।

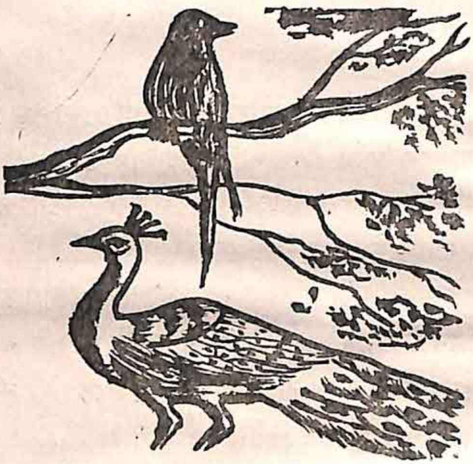
'বিয়ে তো করলে। এখন ঘর বাঁধবে কোথায়? পার্লি বলল, 'এ বাগানে তোমার বাপমার সাথে আমি থাকছি না।'

'কিস্যু ভেব না—আলাদা হলেম বলে—দেখই না তোমার জন্য কি করি।' পার্ল ছোকরা ঠোঁট দেখিয়ে বলল।

পার্ল ডানা গজাতেই মস্তান হয়ে উঠেছে। নতুন কচি বউকে বাহাদুরি দেখাতে সে ছাইগাদার দিকে ছুটল। সেখানে তখন একটা গরিব ছাতার বাসা বাঁধছিল।

পার্লির লজ্জা লাগছে। মিষ্টি পাখি ভাষায় সে পার্লকে বারণ করল মস্তানি করতে। পার্ল গ্রাহ্য করল না। বেচারা ছাতারকে ঠোঁট দিয়ে টেনে বার করে নিজে ঢুকে পড়ল। কিন্তু বউকে এনে ঘরদোর গুছিয়ে বসতে না বসতে ঘাড়ে খেল জোর এক ঠোক্কর। ব্যাপার কি বুঝবার আগেই ছাতার বউ ঝিরা দল বেঁধে এমন হানা দিল যে পার্ল গুঁতো খেতে খেতে গিয়ে পড়ল

নীচের খানাটায়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পার্ল যেই হম্বিতম্বি শুরু করেছে ছাতার পরিবারের সবাইও কিচির মিচির জুড়ে পাড়া মাথায় করছে। সোরগোল শুনে বাগানের প্রধান ময়ূর বেরিয়ে পঞ্চায়েত বসিয়ে দিল। একমত হয়ে পঞ্চায়েতের রায় হল পার্ল দোষী। তাকে সাজা পেতে হবে। পার্ল রাগ করে বলল—থাকব না। এ গাঁয়ে। চল পার্লি, ভিন দেশে গিয়ে রাজার হালে থাকব আমরা।



উড়ে উড়ে দুজনে একটা ঝোপের মধ্যে নামল। মার খেয়ে পার্লের গতরে ব্যথা হয়েছে। এদিকে পার্লি টের পেয়েছে, পেটে তার ডিম এসেছে। কাঁদ কাঁদ গলায় সে বললে—'ডার্লি, তাড়াতাড়ি একটা ঘর বাঁধ, আমি কিন্তু শীগগীর মা হব!' এত ঝামেলার পর পার্লও ভয় পেয়েছে। কিন্তু বউয়ের কাছে তো প্রকাশ করা যায় না! তাই সে দেমাক দেখিয়ে বলল, 'একটা বাসার ব্যবস্থা করা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না। একটুও ভেব না। চল, দম নেওয়া হয়েছে, ওড়া যাক্॥

পার্লিকে নিয়ে পার্ল উড়ে উড়ে পৌঁছল সুন্দর এক নীল নদীর পাড়ে। নদীর ওপাড়ে চমৎকার বিশাল এক লাল পাথরের পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে লাল নুড়ি সাজিয়ে সারি সারি ঘর বাঁধছে হাজার হাজার পাখি ; গাছে গাছে নীড় গড়ছে আরও কত মেয়ে পুরুষ রঙবেরঙের পাখিরা। পার্লি ওদিকে দেখিয়ে বলছে 'দেখ দেখ, ওরা কি সুখে আছে দেখ। ওখানেই একটুকু বাসার খোঁজ নাও না!'

পার্ল মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ওই রকম হাড়ভাঙ্গা খাটতে আমি পারব না। দেখছ না, লাল পাহাড়টা মজুরের দেশ,—মুখ বুজে সব কাজ করে যাচ্ছে! ছোটলোকদের ওই ভীড়ে মরতে যাব কেন?'



পার্ল কথা বলছিল আর আড়চোখে দেখছিল নদীর এ পাড়ে একজোড়া ফিঙ্গে এক জায়গায় বাসা বাঁধছে। মনে মনে সে মতলব সেঁটেছে, বুড়োবুড়ী ফিঙ্গে দুটোকে হটিয়ে ওদের গড়া ঘর-টারই দখল নেবে।

পার্লি ওর মনের ভাব ধরে ফেলে বাগড়া দিল—'না, তুমি অন্যের বাসা নেবে না, ওভাবে আমি থাকব না। তোমাকে আমার জন্য ঘর বানিয়ে দিতে হবে।'

নাচার হয়ে পার্ল বাসা বানানোর কাজে হাত লাগাল। খড়কুটো তুলতে লেগেছে. এমন সময় পার্লি ভয় পাওয়া গলায় বলল,—'হ্যাঁ গো, দেখ দেখ কী ভয়ানক একটা রাক্ষস ওখানে

পার্ল দেখল, বিশ্রী রকমের মোটা গোঁফের একটা তাগড়াই বেড়াল নদীর পাড়ে ঘুম দিচ্ছে। পার্ল বউকে সাহস দেখিয়ে বলল —"ও কি করবে! আমি থাকতে তোমার ভয় কি!"

বালামচি, তুলো, ন্যাকড়া, তার, খড়, কত কিছু খুঁজে পেতে এনে পার্ল একটা ধানের গোলার মাথায় নীড় বানিয়েছে। পার্লি খুসি।

তারপর যখন ওই ঘরে পার্লি একে একে ছটি লাল নীল ডিম পাড়ল, পার্লের তখন আনন্দ দেখে কে! আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে গান গাইতে লাগল—

ফুটফুটে ছানা দেবে টুকটুকে বউটি···
মল দেব, নথ দেব, দেব গড়ে বাউটি।

পার্লি মা হতে যাচ্ছে। পার্লের এখন অনেক কাজ ; অনেক দায়িত্ব। বউএর শরীর সারাতে প্রোটিন চাই। শুধু দানা খাবারে চলবে না পার্ল আদাড়বাদাড় খুঁজে পোকামাকড় জোগাড়ে বেরিয়ে যায় সাত সকালে। বেশিক্ষণ বাইরে থাকতেও পারে না। ঘুরে ফিরে ঘরে আসে, খাওয়ায়, আবার বেরিয়ে যায়।

একটু আগেই পার্ল বউকে ঠোঁটে করে আনা কটা পোকামাকড় খাইয়ে গেছে। পার্লি স্বামীর কষ্টের কথা ভাবছে, হঠাৎ ঘরে কালো ছায়া এসে লাগতেই দেখে,—এক বিঘৎ দূরে দাঁড়িয়ে সেই রাক্ষসটা, সামনে বাড়ানো তার ছুঁচাল নখের থাবাখানা।

পলক পড়তেই তা-দেয়া ডিম আর পালকের বাসা ফেলে রেখে নিজেকে বাঁচাতে সে ফুরুং করে ফোকর দিয়ে উড়ে গেল।

হুলো একবার আড়চোখে দেখে নিল। তারপরই খড়ের চাল থেকে গোটা বাসাটা থাবা দিয়ে টেনে নিল। পার্লি তার মাথার ওপর উড়ে উড়ে হায় হায় করে কাঁদতে লাগল। পার্লও ততক্ষণে এসে গেছে। 'বাঁচাও, রাক্ষসে আমাদের সব খেয়ে গেল, কে কোথায় আছ, বাঁচাও'—পরিত্রাহি চেঁচাল। কিন্তু না, কেউ সাহায্য করতে এল না। আসবে কোত্থেকে? তারা তো নির্জনে বাসা বেঁধেছে।

হুলো বাসাটা মুচড়ে তুমড়ে পার্ল আর পার্লিকে দেখিয়ে দেখিয়ে দামী পাথরের মতো সুন্দর ছ'ছটা ডিম একটা একটা করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেল।

পার্লির বুক ফাটা কান্না আর থামে না। পার্ল তাকে সান্ত্বনা দেয়। না, এখানে আর নয়। নিরাশ্রয় দুটিতে ডানা মেলল অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।

হুলোর নাগালের বাইরে ওক গাছের গায়ে নতুন করে নীড় রচনা শুরু করল পার্ল দম্পতি। এক হপ্তার মধ্যে তৈরী হয়ে গেল নবনীড়! কাছাকাছি গাছগুলিতে প্রতিবেশী হিসাবে রয়েছে আরো অনেক জাতের পাখি। বেশি আছে সোনামুখী আর ধণেশরা। তারা উদ্বাস্তু পার্লদের এ পাড়ায় ঘর বাঁধতে বাধা দেয় নি। কিন্তু পার্লের দেমাকী স্বভাব যাবে কোথায়! কদিন কাটতেই পার্ল সবার সাথে বিবাদ বাধাল। যে কোন ছুতোয় এর ওর সাথে মারামারি বাধিয়ে জানাতে চাইল সে কত বড় মস্তান। অতএব তাকে যেন সবাই খাতির করে চলে। ফল হল উলটো। ধণেশরা একদিন পার্লকে পেটাল। সোনামুখীরা করল একঘরে।

সেদিন দুপুরে পার্ল ঘরে বসে পার্লির সাথে গল্প করছে। গল্প আর কি! দুঃখ করছিল. ডিমগুলো রাক্ষসের পেটে না গেলে এতদিনে ফুটে ছানা হত, তাকে 'মা' 'মা' বলে ডাকত, ঘর ভরে থাকত ওদের নরম মিহি কিচির মিচির সুর। পার্ল সান্ত্বনা দিয়ে বলে' 'ভাবছ কেন! দেখতে না দেখতে তোমার পেটে আবারও তো ডিম এসে গেছে কদিন বাদেই তো সেগুলো পাড়বে '

একটা সোরগোলে তাদের সুখস্বপ্নের কথা থেমে গেল। চারপাশের গাছগুলো থেকে সোনামুখী, ধণেশ কাঠঠোকরারা নানারকম আওয়াজ করছে।

পার্ল বিরক্ত গলায় বলল, এ জন্যই এদের ভাল্লাগে না। ছোটলোকের মত হল্লা করছে কেমন দেখছ। নিরিবিলি শান্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি।

পার্লির কিন্তু মনে হল, হৈচৈটা যেন বিপদের সংকেত। আশংকাটা মনে আসতেই সে ঘর থেকে মুখ বার করল। সর্বনাশ! সেই রাক্ষস, সেই হুলো এখানেও এসে গেছে, গাছ বেয়ে একেবারে তাদের বাসার মুখেই।

পার্লও দেখেছে। দুজনে বাঁচাও বাঁচাও পরিত্রাহি চীৎকার করছে। কিন্তু না, এবারও কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। তবু তো অন্যেরা তাদের সময় থাকতেই চেঁচিয়ে সাবধান করে দিয়েছে।

হুলো গোঁফ খাড়া করে থাবা বাড়িয়ে শয়তানের হাসি দিয়ে বলল 'সেবার তোদের ডিম দিয়ে প্রাতরাশটা বড় ভাল জমেছিল রে, আজ তোদের দুটোকে দিয়ে লাঞ্চটা সেরে যাই।'

কিন্তু হুলোর থাবা ওদের গায় লাগবার আগেই ওরা উড়ে গেল। মুখের গ্রাস ছুটে যেতে হুলো মোটা ভুরু কুঁচকিয়ে চোখ পিটপিটিয়ে বলল—ঠিক আছে সবুর কর। বাছাধনরা কত ম্যায়না দেখা যাবে। কত জায়গায় কতবার তোমরা ঘর গড়তে আর কত ডিম পাড়তে পার আমি দেখব।'

শূন্যে উড়তে উড়তে পার্লি শুনল, হুলো বিড়বিড় করছে 'পরের বার আর ডিম নয়, ছানা ফুটলে বাচ্চাগুলোকে আস্ত গিলবো, আর ঐ মস্তানটাকে বাদ দেব না।'

হুলো চলে যেতে ওরা ভাঙ্গা বাড়িটায় বসে অনেক চোখের জল ফেলল। একটু পরে শরীরটা খারাপ লাগছে দেখে পার্লি স্বামীকে বলল—শুনছ, আমার কেমন কষ্ট হচ্ছে, ডিম পাড়ার বোধ হয় সময় হল, কোথাও একটা ঘর তো এখনই না বাঁধলেই নয়..

পার্ল চিন্তিত মুখে বলল—'কোথায় যে যাই! ঐ রাক্ষস হুলোর নাগালের বাইরে ত্রিভুবনে ঠাঁই মনে হয় নেই।'

পার্লি বলল—কেন থাকবে না। আমার মনে হয়, সেই যে নীল নদীর পাড়ে লাল পাহাড়ের দেশ, সেই যে গো সারি সারি ঘরে

রাশি রাশি পাখি সার বেঁধে গান গেয়ে কাজ করছে . চল না সেখানেই গিয়ে আশ্রয় চাই। ওখানে ওই মোটা কেঁদো হুলো, মাড়াতে ভরসা পাবে না।

'তাই চল।' পাল´ এবার রাজী হল।

'তুমি কিন্তু কারও সাথে ঝগড়া করতে পারবে না।' পার্লি আবদার করে বলল—'ওদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজেও যাবে, বলে রাখছি।

নীল নদীর পাড়ে লাল পাহাড়ে পৌঁছতেই পাল´রা শুনল কোকিলরা তাদের স্বাগত জানাচ্ছে ঃ

এস হে অতিথি নিয়ে স্নেহ প্রীতি সুখি হয়ে থাক সাথী, আর
কিসের ভাবনা তুমি কি জান না হাত হল সেরা হাতিয়ার
ভুলে জাতপাত থাক একসাথ ছাতার বদ্রি মুনিয়া
কাজ কর খাও নাচো গান গাও জিতে নাও সারা দুনিয়া
এ দেশে তো নেই হুলো বাঘ সেই হায়েনা বা বুনো হাতী আর
কিসের ভাবনা তুমি কি জাননা নিজ হাত সেরা হাতিয়ার ?

পাল´ বলল, 'বলছ তো খুব · টিকতে পারব তো ?' কোকিল দলপতি বলল, 'কেন পারবে না ? কাজ করবে, নাচ গান করবে, সবার সাথে ভালবাসা রাখবে, ব্যস, টিকে থাকার জন্য এর বেশি কিছু লাগে না।'

পাল´ বলল. 'আমাকে কি কাজ করতে হবে ?'

দলপতি বলল, 'যা পারবে! তোমরা তো বদ্রি, ঠোঁটে বেশ ধার ইঁদুর মারার কাজ করতে পারবে!'

—'ওরে বাবা, সে তো পুলিশ মিলিটারির কাজ। সে আমরা পারব না।' পাল´ বলল!

দলপতি বলল—আচ্ছা, সে হবে'খন। এখন খালি জমি দেখে নিজেদের ঘরটা বানিয়ে নাও।

পাল´ খুঁতখুঁত করে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল পার্লি,—আর কথা বাড়িও না। এমন সুন্দর দেশ, এত সুন্দর পাখি আর কোথাও দেখনি। এখানেই আমরা চিরকাল থাক্‌ব।'

পাল´ দিনভর খেটে নীড় বাঁধল। সোয়ালো পাখিরা এসে অনেক সাহায্য করল। পরের দিনই পার্লি ডিম পাড়ল। নীল পোখরাজের মত চারটি ডিম। পাল´ আবার বউএর জন্য খাদ্য-প্রাণভরা খাবারদাবারের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করেছে। তার আর তর সইছে না। কখন্ ডিম ফুটে বাচ্চা বেরবে? বার বার বউকে জিজ্ঞেস করছে, 'আর কত তা দেবে? নড়ছে? কিছু টের পাচ্ছ?

পার্লি হাসিমুখে মাথা নাড়ে। 'এখনও নড়ছে না?

'না, এখনও নড়েনি।'

'তোমার কি মনে হয়, বাচ্চাগুলো বেশ বড়সড় হবে?'

পার্লি ধীরভাবে বলে 'লম্বা হবে হয়ত—তুমি যা লম্বা।'

'কি নাম রাখবে?' পাল´ বলে।

'আগে হোকই' পার্লি বলে।

'ছেলেগুলোর নাম হবে চাল´, মেয়েদের চার্লি।'

'আচ্ছা।

পাল´ বউর জন্য পোকামাকড় ধরে ফিরতেই পার্লি ডাকল—'শোন। একটা ডিম মনে হচ্ছে এখুনি ফুটবে। নড়ছে। কান পেতে দেখ তো।'

কোনমতে বউর ঠোঁটে পোকাটা গুঁজে দিয়েই পাল´ ডিমে কান রাখল। ঠিক। শব্দ উঠছে। অতি কচি ঠোঁট দিয়ে ভিতর থেকে ডিমের খোলসে কেউ ঠোকর দিচ্ছে, ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে।

পার্লি নিজেই আস্তে ডিমের খোলসে ঠুকরে ঠুকরে গর্ত করে দিল। পাল´ অবাক খুসিতে দেখল, 'আধ ভাঙ্গা ডিমের খোলসে

বসে আছে ছোট্ট একটা ছানা, চোখ বোজা, পালক নেই, রোমহীন সরু ডিগডিগে গলায় বড় একটা মাথা বসান।

পার্লে'র মন খারাপ হল। তার ছেলেমেয়ে এমন বিচ্ছিরি দেখতে হবে? সে রাগ করে বউকে বলল, 'এ কি বেরল? এ কেমন তামাসা হল?'

পার্লি ওর কথায় কান না দিয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ছানাটাকে চুমু খেয়ে বলল, 'তুমি তোমার কাজ কর। খোলাগুলো ফেলে দাও। অন্য ডিমগুলোও এখনি ফুটবে।'

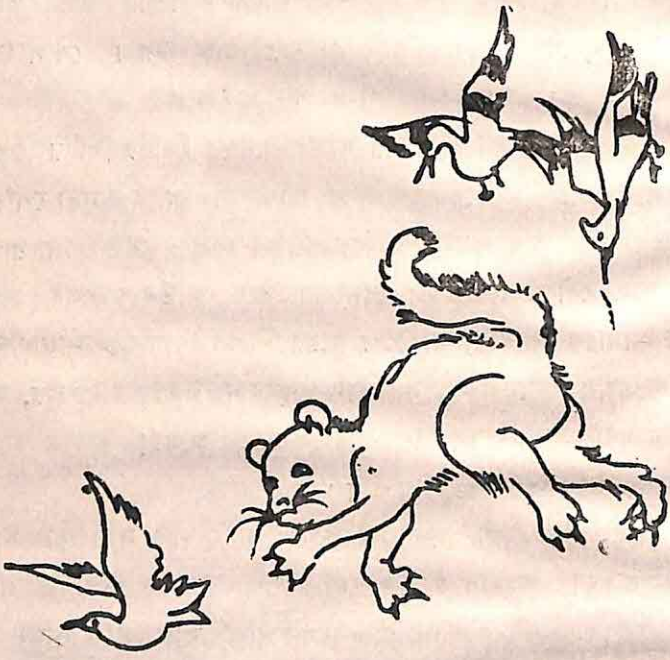
ঠিক এ রকম সময়ে বাইরে অনেক পাখির কিচির মিচির শোনা গেল। পার্ল বাইরে এসে দেখে, সর্বনাশ। এখানেও নদী পেরিয়ে পাহাড়ের চড়াইএ হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হয়েছে সেই হুলো রাক্ষস

পার্ল দৌড়ে ঘরে ঢুকল, দুঃসংবাদ দিয়ে আর্তনাদ করে বলল, সে আমাকে দেখেছে, আমাদের ঘরের দিকেই এগোচ্ছে কাচ্চাবাচ্চা-শুদ্ধ এবারও আমাকে ও না গিলে ছাড়বে না···তাড়াতাড়ি কর, আর ডিম ফুটো করে বাচ্চা বের করে কি হবে, আমরা দুজনে অন্তত বাঁচি...উড়ে পড়, ওড় শীগ্গীর।'

কিন্তু পালি বলল, বাচ্চাদের ফেলে আমি যাব না। তুমি যাও, তুমি বাঁচ। আমার যা হয় হোক।'

হাজার মিনতিতেও পার্লিকে যখন পার্ল বার করতে পারল না তখন সে মরিয়া হয়ে বেবিয়ে এসে হুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা মাথায় ঠোকর খেয়ে হুলো পিছন ফিরে পার্লকে ধরার জন্য লাফালাফি করছে। পার্লও নাছোড়বান্দা হয়ে লড়াই চালাচ্ছে। হুলোর লেজে সে যেই কামড়েছে হুলো অমনি স্প্রিংএর মত লাফ মেরেছে। নির্ঘাৎ পার্লকে থাবায় পেয়েছিল, কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তে কাতারে কাতারে হরিজন ছাতার পাখি, আর্টিস্ট ফিঙ্গে, মজদুর কাক, শালিক, ঘরামি বাবুই, গায়ক কোকিল, নাইটিঙ্গেল, স্কাইলার্ক সবাই এসে ঘিরে ফেলেছে হুলোকে। একটা পাখির উদ্দেশে ঝাঁপ দিতেই দশটা পাখি পিছন

থেকে ঠুকরে ঠুকরে হুলোর লোম ছিঁড়ে নিতে লেগেছে। যন্ত্রণায় ফোঁস ফোঁস করে হুলো এক সময় যেই সামনের পা দুটো তুলেছে একটাকে ধরবে বলে, ছাত্তার পিছনের পা ধরে মেরেছে টান। চিৎপটাং হুলো অমনি গড়াতে গড়াতে একেবারে নীল নদীর অথৈ জলে পড়ল।



পার্লের রাগ তখনও পড়ে নি। জলে হাবুডুবু খেয়ে হুলো নদী সাঁতরে পালাচ্ছিল। সে পিছনে লেগে সারাক্ষণ নদীর ওপর উড়ে উড়ে সমানে ঠুকরে ঠুকরে হুলোর অবস্থা কাহিল করে দিল।

রাক্কুসে হুলোকে এর পর আর কখনো নীল নদী লাল পাহাড়ের ধারে কাছে মাড়াতে দেখা যায় নি।*

*RED HILL রাশিয়ান ব্যালে অবলম্বনে।

পেঁচা কেন নিশাচর



বনের মধ্যে গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করছিল একটা ছোট ছেলে। আচমকা একটা গুলি এসে লাগল পেঁচার গায়। পেঁচা যন্ত্রনায় কাতরাতে লাগল। ব্যথায় অস্থির হয়ে গেল বন্ধু কাকের কাছে।

কাক শুনে বলল—তোমার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। জানতো, এখানে কোকিল ডাক্তারের খুব নাম। চল তোমায় তার কাছে নিয়ে যাই

দুজনে উড়তে উড়তে এল কোকিলের কাছে।

কোকিল পেঁচার মুখে তার অসুখের কথা শুনল। তারপর পরীক্ষা করে বুঝল একটা মাটির গুলি পেঁচার গায়ে ঢুকে আছে আর তারই ব্যথায় পেঁচা কাতরাচ্ছে।

কোকিল বলল—তোমার অসুখটা ধরে ফেলেছি। আমার ফিজটা আগে মিটিয়ে দাও।

পেঁচা কখনও কারোর ধার শোধ করে না। প্রতারক বলে তার ভারী বদনাম। সে কথা ভেবেই কোকিল আগেই ফিজের কথাটা পেড়েছিল। পেঁচা তখন যন্ত্রনায় অস্থির। কোকিলকে বলল—আমার ব্যথাটা সারাতে পারলে আপনার দক্ষিণা আপনি যথা সময়ে পাবেন। এখন যাতে তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে তার ব্যবস্থা করুন।

কোকিল কি করবে ভাবছে। এমন সময় কাক বলল—ঠিক আছে, আমি জামিন থাকছি—পেঁচা যদি টাকা না দেয় তার দায়িত্ব আমার। আপনি নিশ্চিন্তে আমার বন্ধুর চিকিৎসা শুরু করুন

আমার চিকিৎসা পদ্ধতির নাম জলভরণ। কোকিল বলল কাককে—দেখ কোথাও একটু জমা জল খুঁজে পাও কিনা, সেখানে রোগী যেন জলটুকুর মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বসতে পারে। দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ব্যথা সেরে যাবে।

কাক উড়তে লাগল জলের খোঁজে। অবশেষে দেখা গেল পেঁচা ভালভাবে বসতে পারে এরকম খানিকটা জল জমে আছে এক জায়গায়। কাক তখন পেঁচাকে সেখানে নিয়ে গেল। তারপর জলের মধ্যে বসিয়ে দিল কোকিলের নির্দেশমত। পেঁচাকে বসিয়ে রেখে কাক ফিরে গেল তার বাসায়।



জলের মধ্যে বসে থাকার জন্য পেঁচার গায়ের মাটির গুলিটা নরম হতে থাকল আর পুরোটা গলে যেতেই তার গায়ের ব্যথা সেরে গেল। তখন পেঁচা আস্তে আস্তে জল থেকে উঠল। তারপর এতক্ষণের যন্ত্রনা থেকে আরাম পেয়ে এক লাফে মনের আনন্দে আকাশে উড়ল—ফিরে চলল বাসার দিকে।

বাসায় ফিরে সারারাত সে ভাবতে লাগল—দু ঘণ্টা জলের মধ্যে বসে থাকলাম, আর অসুখটা সেরে গেল অথচ আমি এমনি বোকা যে কথাটা আমার মাথায় আগে এল না! আর এ জন্য কিনা আবার চিকিৎসার খরচ জোগাতে হবে কোকিলকে!

এদিকে পরদিন কোকিল এল তার রোগী কেমন আছে দেখতে। দেখল পেঁচা দিব্যি ঘোরাফেরা করছে। কোকিল বলল—চিকিৎসায় রোগী সেরে উঠেছে দেখলে দারুণ ভাল লাগে। এবার নিশ্চয় আমার ফিজের টাকাটা আশা করতে পারি? পেঁচা বলল—আপনি কি মনে করেন ঐ জলটুকুর মধ্যে বসে থাকার নাম চিকিৎসা? এজন্য আপনার তো কোন ওষুধপত্রই লাগেনি! আমি একটি পয়সাও দেব না।

কোকিল মনে মনে বলল—এমনটা যে হবে সে আগেই ভেবে ছিলাম আর সেজন্যই তো ফিজের টাকাটা তখনই চেয়েছিলাম।

কোকিল কাকের কাছে এল। সে বলল ও আপনি ভয় পাবেন না। পেঁচা নিশ্চয়ই রসিকতা করেছে আপনার সঙ্গে। চলুন আমরা দুজনেই পেঁচার কাছে যাই।

কিন্তু পেঁচাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

কোকিল বলল—বেইমানটা আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছে। তুমি জামিন ছিলে, অতএব তোমাকেই এখন আমার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। কাক অমনি বেহায়ার মত বলল—আমি দেউলে, আমি কোত্থেকে দেব?

কোকিলও নাছোড়বান্দা। সে গেল আদালতে মামলা করতে। বিচারক সব শুনে বললেন—কাক ও পেঁচা উভয়েই তো অপরাধী। কাক জামিন ছিল তারই দায়িত্ব টাকাটা মিটিয়ে দেবার। কিন্তু সে যখন তা দিতে পারছে না তখন তাকে সেবা দিয়ে টাকা শোধ করে দিতে হবে। তাই আমার রায় হোল, কাক কোকিলের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাবে। আর কোকিল দিনের আলোয় বেরলেই যেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সেই থেকে কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে। কাক সেই ডিমে তা দেয়। আর পেঁচা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য নিশাচর হয়ে সারাদিন গাছের কোটরে লুকিয়ে থাকে।

মোরগ কেন ভোরে ডাকে



অনেক অনেক কাল আগে মোরগের লেজ ছিল যেমন লম্বা-চওড়া তেমন সুন্দর। ময়ূর ছিল মোরগের জ্ঞাতি ভাই, কিন্তু তার লেজ ছিল খাটো। মেঘ করলে মোরগই পেখম তুলে নাচত রেশমী গাঢ় নীল চোখের নক্সায় মোরগের লেজের বাহার তাকে পাখিদের রাজা করে রেখেছিল।

একদিন ভোরে ময়ূর মোরগকে বলল, মোরগভাই, কোকিলের বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে যাব . ওরা আমাকে অনেক করে নাচতে বলেছে আমার লেজের তো এই ছিরি···সুন্দর বড় লেজের সাজ ছাড়া কি নাচা যায়? তোমার লেজটা আজকের মতো আমায় ধার দেবে?

মোরগ বলল—কখন ফেরৎ দেবে?

ময়ূর বলল—তিন প্রহর থেকে ভোর ভোর বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে তোমার লেজ ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

ভালমানুষ মোরগ লেজটা ময়ূরকে দিয়ে দিল। ময়ূর বেনারসীর মতো লেজ লাগিয়ে পেখম তুলে নাচতে নাচতে চলে গেল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। দেখতে দেখতে তৃতীয় প্রহরও শেষ। ময়ূর ফিরল না। মোরগের বউ মুরগী ঝুপড়িতে ছানাদের বুকের পালকে ঢেকে ঘুমিয়েছে। মোরগের চোখে ঘুম নেই। নিজের লেজহীন চেহারাটা মুরগীকে দেখাতে পারছে না। সকাল থেকে পাখ-পাখালিরা বলে গেছে

পেখম ছাড়া মোরগকে পাখি বলেই মনে হচ্ছেনা,...পেখমশুদ্ধ লেজ ছাড়া মোরগকে তারা পাখি বলে মানবে না।

রাত যত বাড়ে মোরগের দুশ্চিন্তা তত বাড়ে। তৃতীয় প্রহরে মোরগ বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে অন্ধকার ফুটো করে ডাকে .

কঁকর কঁক কঁকর কঁক
আপন জন এমন ঠক্ !

রাত্রি গভীর হয়। জোনাকিরাও ঘুমিয়ে যায়। ঘুমায় না কেবল মোরগ। ঝুপড়িতে ঢুকে একটু ঝিমিয়েই ধড়ফড় করে জেগে বাইরে চলে আসে, গলা উঁচু করে আওয়াজ দেয় ....

কোঁর কোঁর ময়ূর চোর
চোঁর চোঁর কঁকর কোঁর

এক সময় মোরগেরও তন্দ্রা আসে। স্বপ্ন দেখে. ময়ূর এসে বলছে লেজটা বনের পথে হারিয়ে গেল ধড়মড়িয়ে ওঠে মোরগ। দেখে, রাত ফর্সা হয়ে এল শুকতারা জ্বলজ্বল করছে

আলোর কুঁড়ি ফুটতেই মোরগ প্রাণপণে ডেকে ওঠে—

কঁকর কুঁর কুঁর কুঁর
ময়ূর ভাই কত দূর

কিন্তু ময়ূর ? ময়ূর কোথায় ? সে কি কখনো মোরগের লেজ ফিরিয়ে দিতে আসবে ?

দিন যায়, রাত যায়, বছর যায়। নদী দিয়ে কত জল বয়ে যায়। মোরগের নতুন লেজ গজিয়ে যায়—কিন্তু মোরগের আগের বড় লেজ হারানোর শোক যায় না।

মোরগেরা সেই থেকে ময়ূরের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় কিংবা পেখম হারানোর বেদনায় রাতের তিন প্রহরে তিনবার ডেকে ওঠে-

ঘুম ভাঙানো ভোরের ভোঁ
কঁক কঁক কোঁকর কোঁ

সী



গোল রুটি

এক বুড়ো ছিল। তার এক বুড়ী ছিল। তারা ভারি গরীব ছিল। তাদের ভরপেট খাবার মিলত না।

বুড়ো একদিন বলল, বুড়ী খিদেয় যে মরে যাই। একটা রুটী-টুটী দেখ, না।

বুড়ী তখন কি করবে? ঘরে ময়দার যে ঝুড়ি ছিল তাই এনে খুব করে ঝেড়েঝুড়ে যেটুকু ময়দা বার করতে পারল তাই দিয়ে চাকার মতো একটা গোল রুটি বানাল। তারপর বুড়োকে বলল চল চান করে আসি।

বুড়োবুড়ী যেই হেঁসেল থেকে ঘরে গেছে, অমনি গোল রুটি লাফ দিয়ে জানালা টপকে নেমে গর গর করে গড়িয়ে পালিয়ে গেল।

যেতে যেতে দেখা হলো এক খরগোশের সঙ্গে। গোলরুটির পথ আটকে খরগোস বলল,—ভাগ্যে গেল জুটি মিষ্টি গোল রুটি···এস তোমায় খাই—।' থাবা থেকে নোখ বার করে খরগোশ রুটিকে ধরতে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি গোল রুটি বলল, 'অমন কাজ কর না শশক ভাই আমি একটা গান গাই। গানটা শোনার পর আমায় না হয় খাবে।

—ঠিক আছে...গান শুনলে খিদে বাড়ে...খাওয়ার আগে গান শোনাটা বেশ ফাউ হবে ..কর গান।

গোল রুটি গান ধরল—

ঝুড়ি ঝেড়ে বুড়ী এক
কুড়িয়েছে ময়দা
সেঁকে টেকে গোল রুটি
করেছে যে পয়দা
খেতে দিতে বুড়ো বরে
বুড়ি যেই গেছে ঘরে
পালালাম তাল বুঝে
মর বুড়ী রুটি খুঁজে
সর সর, গর গর চলে যাই গড়িয়ে
পারিস তো ধর ধর যে আছিস ধরিয়ে ।

খরগোশ গা এলিয়ে গান শুনছে চোখ বুজে,—গান ফুরোতে চোখ মেলে দেখে গোল রুটি পালিয়েছে ।

যেতে যেতে যেতে নেকড়ের সঙ্গে দেখা—'পেয়েছি রে পেয়েছি, গোল রুটি খেয়েছি ।' নেকড়ে জিভ বার করে গোল রুটিকে ধরার মুখে সে বলে উঠল—

নেকড়ে ভাই ধরো না ..
জিভ লকলক কোর না ..
আপনি ভারি বুদ্ধিমান...
খাওয়ার আগে শুনুন গান ..

নেকড়ে বলল—'ঠিক আছে। কর গান ।'

গোল রুটি গান ধরল—

ঝুড়ি ঝেড়ে বুড়ী এক
কুড়িয়েছে ময়দা ..
সেঁকে টেকে গোল রুটি
করেছে যে পয়দা ..
যেতে যেতে যেতে যেতে ..
খরগোশ এল খেতে...

পালালাম তাল বুঝে
খরগোশ মর খুঁজে ..

চোখ বুজে গান শুনছিল নেকড়ে···গান শেষ হতে চেয়ে দেখে গোল রুটী পালিয়েছে।

যেতে যেতে যেতে ভালুকের সঙ্গে দেখা। ভালুক পথ আটকে বলল—

আকাশের চাঁদ এলি
আয় তোকে খেয়ে ফেলি।'

গোল রুটী বলল—

ভালুক ভাই ভালুক ভাই
অমন কাজ করতে নাই—
একটু থাকো চোখ বুজে
আমি তোমায় গান শোনাই।

ভালুক বলল—ঠিক আছে, কর গান।

গোল রুটী গান ধরল— ঝুড়ী ঝেড়ে বুড়ী এক
কুড়িয়েছে ময়দা

ভালুক তাড়াতাড়ি চোখ খুলে দেখে গোল রুটী হাওয়া।

যেতে যেতে যেতে খেঁকশিয়ালের সঙ্গে দেখা। শিয়াল বলল—

বারে বাঃ গোল রুটি! পেটে আয় গুটি গুটি

গোলরুটি বলল দোহাই শিয়াল ভাই, আমাকে আগেই খেও না .আমি একটা গান গাই—দেখ তাতে তোমার আমাকে খেতে আরো ভালো লাগবে—

শিয়াল বলল—বেশ বেশ! তুমি তাহলে আমার জিভে বসে গান কর।

গোলরুটি শিয়ালের জিভে লাফিয়ে উঠল· তারপর গান ধরল

ঝুড়ি ঝেড়ে বুড়ী এক কুড়িয়েছে ময়দা—

হায় হায়—গান শেষ হবার অনেক আগেই গোল রুটি গর গর করে গড়িয়ে কখন শিয়ালের পেটে চলে গেছে।

ঠাকুর্দা



অনেক আগে একটা দেশ ছিল। সে দেশে নিয়ম ছিল, মানুষ বুড়ো হলে মেরে ফেলা হবে। বুড়ো ধরা হত ঠাকুর্দাদের। এক পরিবারে তিন পুরুষ এসে গেলেই, বৃদ্ধ পিতামহকে হয় আত্মহত্যা করতে নয় পুত্রের হাতে মরতে হত।

ঐ দেশের এক গাঁয়ের এক পরিবারের একজন যুবকের নিজের পুত্রটির বয়স যেদিন পাঁচ পূর্ণ হল সেদিন তার ওপর গাঁয়ের মোড়ল ও পুরোহিতের আদেশ এল, আর দেরি না করে পিতার মৃত্যুর ব্যবস্থা কর।

যুবকটি নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধ পিতাকে কথাটা জানাল। বৃদ্ধ বললেন, দেশের নিয়ম তো মানতেই হবে। আমিও আমার পিতাকে হত্যা করেছিলাম। যদিও আমার মনের সায় ছিল না। আমি আত্মহত্যা করব না। তুমি বরং আমায় মেরেই ফেল। তবে কি জান, একটা নিয়ম খুব পুরোন হলেই যে ভাল বা চিরকাল চলা উচিত তা মনে কর না। যা-ই কর, নিজের ভবিষ্যৎ ও পরিণাম চিন্তা করে করবে।

যুবক পিতার কথার মর্মার্থ বুঝলনা। বুঝলেও দেশের নিয়ম ভাঙ্গার উপায় ছিল না। অতএব সে একটা কফিন বানিয়ে বাবাকে তার ওপর শুইয়ে মাথায় চাপিয়ে নিয়ে চলল গাঁয়ের বাইরে গভীর বনের দিকে। তার শিশু পুত্রটি সঙ্গ নিল।

বৃদ্ধদের মেরে ফেলার উপযুক্ত জায়গা মনে করা হত গভীর বন, গহীন নদী বা সাগর। হত্যা করার পর পশু পাখীদের খাদ্য হিসেবে মৃতদেহ ফেলে রেখে আসা হত।

যুবকটি নিয়মমত পিতাকে নিয়ে বনে পৌঁছিয়ে যখন বাবাকে বলল, 'তুমি চোখ বোজ, আমি কোপ মারছি,' তখন হঠাৎ বালক পুত্র তাকে প্রশ্ন করে বসল, 'বাবা. তুমি ঠাকুর্দাকে কি করছ?'

যুবক হাতের ধারাল কাটারি নামিয়ে বলল, 'কেটে ফেলছি।'

শিশু বলল, 'কেন? ঠাকুর্দা কি দোষ করেছে?' যুবক পিতা বলল, 'তোমার ঠাকুর্দা বুড়ো হয়ে গেছে, কাজ করতে পারে না, আমার রোজগারে খায়,... —'ও! এই!' শিশু পুত্রটি বলল, 'তাহলে বাবা, ঠাকুর্দাকে কাটা হয়ে গেলে কাটারিটা আমাকে দিও।'

'—না, না। তুমি এ নিয়ে কি করবে?' বলল যুবক পিতা। শিশু বলল, 'রেখে দেব। তুমিও তো বুড়ো হবে, ঠাকুর্দা হবে, তখন আমাকে তো তোমাকে কাটতে হবে'

শিশু পুত্রের মুখে কথাটা শুনে যুবক পিতার মুখে ভয় ফুটে উঠল। আর বৃদ্ধ পিতামহের ম্লানমুখে ফুটল কৌতুকের হাসি।

যুবকটি পুত্রকে বলল, 'না, তোমার ঠাকুর্দাকে আমি মারব না। চল, ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। তুমি কিন্তু বাবা কথাটা কাউকে বলবে না।'

শিশুটির খুব আনন্দ হল। সে ঠাকুর্দাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ঘরে চল।'

যুবক পুত্র ও পিতাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ফিরে এসে

বাড়ির পিছনে একখানা গোপন ঘরে বৃদ্ধকে লুকিয়ে রাখল। পরিবারের সবাইকে বলে দিল, কেউ যেন গাঁয়ের কাউকে কথাটা না জানায়। রোজ বৃদ্ধকে খাবার ও অন্য দরকারী জিনিসপত্র গোপনে সময়মত দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

এ দিকে ঐ বছর ঐ দেশে গো-মড়ক দেখা দিল। গুটি বসন্তে দেশের সব গরু মোষ মারা গেল। মড়কের শুরুতেই খবরটা শুনে পিতামহ পুত্রকে বললেন, 'শোন বাছা, আমাদের গাই বলদগুলিকে আজ থেকে বাইরে বের করবে না, মাঠে চরাবে না, বাইরের ঘাস জল খেতে দেবে না। ঘরের চাল থেকে খড় খুলে খেতে দেবে। আর, গোয়ালটা বউমাকে দিয়ে দু'বার করে সাফ করাবে।'

বৃদ্ধের পরামর্শ শুনে একমাত্র এই যুবকের গাইবলদগুলি ঐ মড়কে রক্ষা পেল। সে দিব্যি ঐ বছর চাষাবাদ সেরে ফসল তুলল। অথচ গাঁয়ের অন্য কোনো পরিবারেই সে বছর ফসল ওঠে নি।

পরের বছর ঐ দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। কেননা, অতিবৃষ্টি ও বন্যায় সকলেরই বীজতলা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় পিতামহ পুত্রকে বললেন, 'শোন বাছা, হতাশ হবে না, নিরুদ্যম হবে না। আমাদের ঘরের চালে যে খড় চাপান আছে ওইগুলি সব নামাও। ভাল করে ঝাড়াই কর। দেখবে গতবছরের অনেক বীজ ধান ওতে লেগেছিল। সেগুলি পাবে। গতবার তোমায় বলেছিলাম না, ঘর ছাইবার খড়ে যেন কিছু ধান লেগে থাকে, কেন বলেছিলাম, এখন তা বুঝবে।'

যুবকটি বৃদ্ধের পরামর্শমত ঘরের চাল থেকে সব খড় নামিয়ে আনল। সবাই মিলে ঝাড়াই করল। অনেকখানি বীজধান মিলল। ক্ষেত থেকে জল সরে যেতে নতুন করে বীজতলা বানাল। চাষ করল। এবছরও গাঁয়ে একমাত্র তারই ঘরে ফসল উঠল।

পর পর দু'বছর এই যুবককে এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রেহাই পেতে দেখে গাঁয়ের অন্য সকলের ঈর্ষা ও সন্দেহ দেখা

দিল। তারা ভাবল, নির্ঘাৎ কোনো দেবতার ভর হয়েছে ঐ যুবকের ওপর। ব্যাপারটা বুঝতে সবাই তার বাড়ীতে ঢুকে অনুসন্ধান শুরু করতেই বৃদ্ধ পিতামহকে আবিষ্কার করল।

—'তবে রে, মিথ্যাবাদী, বদমাস, বুড়োকে বাঁচিয়ে রেখে মেরে ফেলার গপ্প ফেঁদেছিলি, দেখাচ্ছি মজা' হৈ হৈ করে গাঁয়ের মাতব্বররা যুবকটিকে ধরে নিয়ে চলল রাজধানীতে, সোজা হাজির করল রাজার সামনে।

সব শুনে রাজা রাগে লাল হয়ে বললেন,— এত স্পর্দ্ধা তোমার, জান, এ অপরাধের কি সাজা ?'

যুবক বলল, 'জানি মহারাজ। মৃত্যু। তবে মহারাজ, আমার গর্দান নেবার আগে কেন আমি দেশের ঐতিহ্য ভেঙেছি তা আপনাকে বলে যেতে চাই।'

'ঠিক আছে। বল।' রাজা বললেন।

যুবক বলল, 'মহারাজ, পর পর দু বছর দেশ শুদ্ধ মানুষ মড়ক ও দুর্ভিক্ষে ফসল পায় নি, অর্ধাহারে কাটিয়েছে। একমাত্র আমি ঘরে ফসল তুলেছি, যা দিয়ে একা আমার পরিবার নয়, গাঁয়ের আরও অনেক মানুষের অন্ন সংস্থান হয়েছে'। রাজা বললেন, 'শুনেছি। নিশ্চয় কোন দেবতার ভর পেয়েছিলে ? কে, কোথায় তোমার সেই দেবতা ?' যুবক বলল, 'মহারাজ, সে দেবতা হলেন আমার বৃদ্ধ পিতা, তিনি আছেন আমার গোপন গৃহে আমার পুত্রের পিতামহরূপে। তাঁরই পরামর্শে আমি প্রথম বছর বাঁচিয়েছিলাম আমার গো সম্পদ আর পরের বছর পেয়েছি বীজধান।'

সব শুনে রাজা বললেন, 'আশ্চর্য! এতকাল আমরা কেবল শাস্ত্র আর ঐতিহ্যের সংস্কারে একটা নিয়ম মেনে এলাম, একবারও ভেবে দেখলাম না, নিয়মটার প্রয়োজন আছে কিনা, নিয়মটা কল্যাণকর কি না ? এই যুবক একটা অপরাধ করে আমাদের চোখ খুলে দিল।'

যারা যুবকের গর্দান নেবার অনুষ্ঠান দেখবে মনে করে ভীড় করেছিল তারা অবাক হয়ে শুনল, রাজা বললেন, যুবকদের মতো বৃদ্ধদেরও প্রয়োজন আছে। যুবকের যেমন আছে কাজ করার ক্ষমতা, বৃদ্ধের তেমনি রয়েছে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। পেশীশক্তিই সব নয়, পরিণত বুদ্ধিও চাই। অতএব আজ থেকে আবহমাণ বিধান বাতিল করা হল। প্রদত্ত হল পিতামহ বৃদ্ধদের বেঁচে থাকার অধিকার। 'যুবক বেকসুর খালাস।'

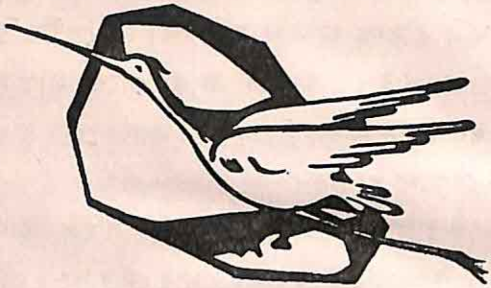
যারা ঐ যুবককে রাজার কাছে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল তারাই তাকে আনন্দে মাথায় করে গাঁয়ে ফিরল। আর যে বৃদ্ধকে বেঁচে থাকতে দেখে তারা ক্রুদ্ধ হয়েছিল তারই পায়ে প্রণাম করতে করতে আহ্লাদে দিশাহারা হয়ে তারা ছড়া গাইতে থাকল :

তাক্ ডুমা ডুম্ তাকুড় তা
বেঁচে থাকুক ঠাকুর দা।*



*লাটভিয়ান লোককথা "The wisdom of age" অবলম্বনে।

নীলকণ্ঠ পাখির শিস



একজন অন্ধ ধনীর তিন পুত্র ছিল। পিতার ধারণা ছিল, পুত্রদের মধ্যে ছোটটি বোকা, বাকী দুটি খুব চালাক চতুর। আসলে ছোট ছেলেটি ছিল সরল ও সৎ। এর জন্যই তাকে বোকা মনে হত।

একদিন পিতা পুত্রদের ডেকে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অঢেল সম্পদ রেখেছি, তোমরা আমার জন্য কি রেখেছ? তোমরা কি আমার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিতে পার না?

তিন পুত্রই বলল, 'যদি উপায় জানা থাকত তাহলে জীবন দিয়ে তোমার দৃষ্টি এনে দিতাম।'

পিতা বললেন, 'আমার কাছে খবর আছে, কোনো এক দুর্গম দেশে, একজন রাজকন্যা আছেন যার রয়েছে এক আশ্চর্য নীলকণ্ঠ পাখি। তার গলায় আছে যাদু সুর। পাখিটিকে চুরি করে এনে দিতে পারলে, ঐ পাখির গান শুনলে অন্ধজনও দৃষ্টি ফিরে পায়।'

ছোট ছেলেটি বলে উঠল, 'কিন্তু বাবা, চুরি করা তো ঠিক নয়।'

অন্ধ পিতা ধমকে বললেন,— 'চুপ কর, আহাম্মক কোথাকার! তোমার দ্বারা যে আমার কোন কাজ হবে না সে আর আমার জানতে বাকী নেই।'

অন্য দু' ভাই চুপ করে শুনছিল। তারা বলল, 'বাবা, আমাদের যদি তুমি প্রয়োজন মত টাকা পয়সা ও যানবাহন দাও তাহলে আমরা তোমাকে পাখিটা এনে দেব।' অন্ধপিতা খুব খুসি হয়ে বললেন, 'তোমরা যত খুসি অর্থ ও অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়। তিন বছর সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমরা ফিরে আসবে। মনে রেখ, পাখিটা রয়েছে রাজকন্যার ঘরে সশস্ত্র পাহারায়। ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। সাবধানে যেও। ততদিন আমার দেখা-শোনার জন্য তোমাদের এই বোকা ভাইটাকে দিয়ে চালিয়ে নেব।'

দু' ভাই রাজপুত্রের মত সেজে তেজী ঘোড়ায় চেপে রাশি রাশি সোনাদানা টাকা কড়ি নিয়ে রাজকন্যার সন্ধানে বেরল।

বহুদূরে এসে গভীর অরণ্যে এক বৃদ্ধের সাথে দেখা। বৃদ্ধটি বলল, 'তোমরা কিসের সন্ধানে বেরিয়েছ? উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, আমি তোমাদের পথ দেখাব।'

ওরা জরাজীর্ণ দীন দরিদ্র বৃদ্ধকে অপমান করে বলল, দূর হ বুড়ো থুত্থুরো।

দু'ভাই কিছু দূর যায় আর পথের পাশের সরাইখানায় রাত কাটায়, খানাপিনায় দু হাতে টাকা ওড়ায়, সরাই মালিকের সঙ্গে দিনভর জুয়া খেলে, মজা করে। দেখতে দেখতে তিন বছর চলে যায়। রাজকন্যা ও তার পাখির দেশে পৌঁছান হয় না।

অন্ধ পিতা হতাশ হন। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বলেন, 'নিজের সুখের আশায় আমি আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান দুটিকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিয়েছি। হায়, এ আমি কি করলাম। নির্ঘাৎ ওরা ওই রাজকন্যার প্রহরীদের হাতে ধরা পরে নিহত হয়েছে।

পিতাকে প্রতিদিন বিলাপ করতে দেখে বোকা অনুরোধ করে, 'আমাকে অনুমতি দাও, দাদাদের সন্ধান করি আর পাখিটাকেও আনতে পারি কিনা দেখি।'

পিতা বলেন, তুই হলি আকাট বোকা, আমার অমন দুই চালাক ছেলে যা পারেনি, তুই তা পারবি কি করে? বোকা ছেলে

বলে, 'তবু তুমি অনুমতি কর, একবার চেষ্টা করে দেখি।'

শেষে বিরক্ত হয়ে পিতা বললেন, 'যা যেখানে খুসি। তবে বেশী টাকা পয়সা পাবে না ভাল ঘোড়াও নয়।'

বোকা সামান্য কিছু অর্থ ও বুড়ো একটা বাতিল ঘোড়া নিয়ে যাত্রা করল।

দেখা হল সেই বৃদ্ধের সাথে। প্রণাম করে সে নিজেই তার উদ্দেশ্য জানিয়ে রাজকন্যার নিশানা জানতে চাইল। বৃদ্ধ পথের হদিশ দিয়ে কিভাবে রাজকন্যার ঘরে প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে প্রবেশ করতে ও বেরিয়ে আসতে হবে তা জানিয়ে বললেন, 'পথের কোন সরাইখানায় রাত কাটানর সময় যতটুকু না খেলে নয় তার বেশী খাবে না। স্ফূর্তি করবে না, জুয়া খেলবে না, নেশা করবে না, এ নিয়মগুলি যদি মান কেবল তাহলেই নীলকণ্ঠ পাখি নিয়ে অন্ধ পিতার দৃষ্টি ফেরাতে পারবে।'

বোকা বৃদ্ধের উপদেশ মেনে এক রাত্রে রাজকন্যার ঘরে প্রবেশ করল। রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। একপাশে খাঁচায় নীলকণ্ঠ পাখি। খুব সাবধানে সে খাঁচাটা নিয়ে বেরবার সময় ভাবল, রাজকন্যার একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখা ভাল। রাজকন্যার অনামিকা থেকে আলতোভাবে খুলে নিল আংটিটা। নিজের আঙ্গুলে কিন্তু ঢোকাল না। কাপড়ে লুকিয়ে রাখল। প্রহরীরাও ঘুমিয়েছে।

ফেরার পথে একটা সরাইখানায় রাত কাটাতে আশ্রয় নিয়েছে। খাঁচার পাখি কিন্তু আগাগোড়া বোবা। একবারও ডাকেনি। বোকা সরাইখানার মালিককে বলে দিয়েছে পাখিটা সে কোথা থেকে কিভাবে কিজন্য এনেছে। সরাই মালিক বলল, 'তোমার লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। তোমার দাদারা যা পারেনি, তুমি তা পেরেছ, তোমার তো এখন ফূর্তি কর উচিত। এস ফুর্তি কর'।

সরাই মালিক তার সামনে নিয়ে এল পরীর মতো একটি মেয়ে, বলল 'এ নাচবে গান করবে।'

বোকা রাজি হচ্ছিল, এমন সময় তার বৃদ্ধের উপদেশ স্মরণ হল। তাড়াতাড়ি বলল 'না, না, আমি এ সব চাই না। আমি এখন ঘুমুব।'

এক ঘুমে ভোর হোল। বোকা খাঁচা নিয়ে নিজের বেতো ঘোরায় উঠতে যাচ্ছে, নজরে এল সরাই মালিকের বাড়ির বাগানে দু জন মানুষ কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। তাদের পায়ে শিকল। কৌতূহল হল। কাছে গিয়ে দেখে, তার দুই চালাক ভাই। সরাই মালিকের কাছে ফূর্তি করে আর জুয়া খেলে ঘোড়া ও অর্থ সব খুইয়েছে। এমন কি তারও বেশী ঋণ করেছে। সেই ঋণ শোধ করছে ক্রিতদাস থেকে। বোকা সরাইমালিককে নিজের সব অর্থ দিয়ে চালাক ভাইদের মুক্ত করল।

তিন ভাই ফিরছে। পথে সেই বন। দুই চালাক পরামর্শ করে হঠাৎ বোকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেরে মেরে যখন মনে হল মরে গেছে তখন খাঁচাটা নিয়ে বোকার ঘোড়ায় চেপে দু'জনে ঘরে ফিরল।

অন্ধ পিতার তো আনন্দ ধরে না। বোকার বদলে ফিরে পেয়েছেন দুই চালাক চতুর পুত্রকে। রাজকন্যা ও সেই যাদু নীলকণ্ঠ পাখি!

এদিকে রাজকন্যা তার পাখি চুরি গেছে দেখে যতনা রাগ করলেন তার চেয়ে বেশী হলেন অবাক্। তিনি ঠিক করলেন, যে তার পাখি নিয়ে গেছে তাকে বিয়ে করবেন। কথাটা প্রচার হতে দুই চালাক ভাই পাখি নিয়ে তার সামনে হাজির

রাজকন্যা বললেন, 'তোমরাই যে আমার পাখি চুরি করেছ তার প্রমাণ দাও।'

বড় চালাক বলল, 'প্রমাণ তো আপনার এই পাখি! রাজকন্যা বললেন, 'পাখিটা যে তোমরা অন্য কারও থেকে চুরি করনি তার প্রমাণ কোথায়?'

এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় রাজকন্যা প্রহরীদের বললেন, 'এই চালাকদের বেঁধে আমার পোষা সিংহকে খেতে দাও।'

বনের মধ্যে আহত বোকাকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছেন সেই সন্ন্যাসী বৃদ্ধ। তাঁর পরামর্শে বোকা রাজকন্যার সামনে একদিন উপস্থিত হল। রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তরে সে কাপড়ের গিঁট থেকে আংটি বার করে তাঁর সামনে রেখে বলল, 'আমিই যে আপনার পাখি চুরি করেছিলাম তার প্রমাণ আপনার এই আংটি।'

রাজকন্যা খুসি মুখে বললেন, 'আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

বোকা বলল, 'কিন্তু রাজকন্যা, আমি তো চোর, তাছাড়া বোকাও।'

'রাজকন্যা বললেন, 'তুমি বোকা নও, তুমি সরল ও সৎ। তুমি চোর নও, তুমি পিতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ।'

বোকা বলল, 'কিন্তু রাজকন্যা, আমি তো আমার পিতার দুঃখ দূর করতে পারলাম না,—তাঁর অন্ধত্ব ঘুচল না তো! রাজকন্যা বললেন, 'ঘুচবে।' তখনই রাজকন্যার পাশ থেকে সোনার খাঁচা খুলে বেরিয়ে এল এক দৈবী সুর—নীলকণ্ঠ পাখির শিস।*



যাদু গামলা



এক চাষী নিজের জমিতে কাজ করার সময় মাটি খুঁড়ে একখানা মস্ত বড় গামলা পেয়েছে। ঘরে এনে, ওর মধ্যে পথে পাওয়া একটা তাল রেখে আবার কাজে গেছে। ফিরে এসে দেখে, গামলা ভর্তি তাল। গুণে দেখল একাশিটা। এত তাল এল কি ভাবে? ঘরের পরিজনরা বললে, তারা কিছু জানে না। ব্যাপার কি বোঝার জন্য চাষী গামলায় একখানা খোলামকুচি রাখল। কি আশ্চর্য! দেখতে দেখতে গামলা ঠিক এক মাপের খোলামকুচিতে ভর্তি হয়ে গেল। গুনে দেখে, এবারও সেই একাশিটি।

বোঝা গেল, গামলায় যাদু আছে। চাষীর তো আনন্দ ধরে না! যাক বাবা, এ্যাদ্দিনে তাহলে তার দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচবে! গামলায় একটা করে টাকা রেখে প্রতিবার একাশিটা করে নিলেই ব্যস! এরই নাম ভাগ্য! কপাল যাকে বলে! কপালে না থাকলে গাধার মতো খেটে কি কারও কোনদিন অভাব অনাহার ঘোচে নাকি? এখন থেকে তাকে আর দিনভর মজুরী করতে হবে না! যাদু গামলায় যা ফেলবে তাই একাশিখানা করে পেয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, চাষী মনে মনে বলল, সে বেশী

লোভ করবে না। যতটুকু দরকার তার বেশী সে গামলা থেকে তুলবে না।

এদিকে যাদু গামলার খবর গাঁয়ের জমিদারের কানে পৌঁছাল। জমিদার বললেন, চাষীর আবার নিজের জমি কি? গাঁয়ের সব জমিরই মালিক জমিদার। গামলাটা যখন আমারই জমিতে পাওয়া গেছে তখন আমিই হলাম ওর মালিক।

পেয়াদা লেঠেল পাঠিয়ে জমিদারবাবু গামলাটা চাষীর থেকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন।

খবরটা জেলা শাসকের কাছে পৌঁছতে বেশী সময় লাগল না। 'আমার হুকুমের এলাকায় যখন গামলাটা মিলেছে তখন আইনত আমিই হলাম এর মালিক।'

হুকুম জারি করে পুলিশ পাঠিয়ে জমিদারের ঘর থেকে তিনি যাদু গামলাটা নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

রাজার কানে কথাটা পৌঁছতেই গমগম শব্দে তিনি বললেন, 'আমার রাজত্বের প্রতিটি সেঃ মিঃ জমির হলাম আমিই এক এবং অদ্বিতীয় মালিক। অতএব এই জমির ভিতরে ওপরে শূন্যে যা কিছু মিলবে বা ফলবে সবেরই মালিক হলাম আমি।'

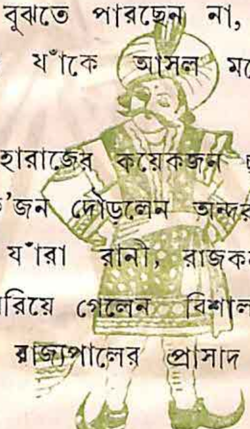
সৈনিক পাঠিয়ে রাজা তখনই জেলা শাসকের ঘর থেকে যাদু গামলাটা নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

যাদু গামলায় হীরা মুক্তা মোহর ফেলে মহারাজ একাশিটি করতে লাগলেন এবং দেখতে দেখতে সীমাহীন বিত্তশালী হয়ে উঠলেন। নিয়ম মত, বিত্ত যার, শক্তি তার। বিত্তবান থেকে যেই তিনি শক্তিমান হলেন, অমনি প্রতিবেশী দেশগুলি আক্রমণ করে নিজের রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে জগদীশ্বর হয়ে উঠলেন।

একদিন জগদীশ্বরের কৌতূহল হল, যাদু গামলার রহস্য উদ্ঘাটন করবেন। বাইরে থেকে গামলাটির কোন নতুনত্ব নেই। পোড়া মাটির তৈরী খুব বড় জলের জালা একটি। তখন ভিতর থেকে

পরীক্ষা করে দেখবেন বলে মহারাজ গামলার ভিতরে নিজেই যেই নেমেছেন অমনি একজন করে একই রকম পোশাক ও চেহারার মহারাজ গামলা থেকে লাফিয়ে মেঝেয় নামতে লাগলেন। যতক্ষণ না গুনে গুনে একাশিজন হল, ততক্ষণ গামলা খালি হল না।

প্রাসাদের বিশাল দরবার কক্ষ একাশিজন রাজায় গিজ গিজ করছে! প্রত্যেকেই দাবী করছেন, তিনিই হলেন আসল মহারাজ, বাকীরা সব নকল, প্রতারক। মন্ত্রী, সচিব, আমলা, সেনানায়কগণ বুঝতে পারছেন না, কাকে তারা গ্রহণ ও মান্য করবেন। যাঁর যাঁকে আসল মনে হল তিনি তাঁর দিকে চলে গেলেন।



একাশি মহারাজের কয়েকজন ছুটলেন সিংহাসনের দখল নিতে। অন্য ক'জন দৌড়লেন অন্দর মহলে রাণী ও মহিলাদের দখল করতে। যাঁরা রানী, রাজকন্যা, সিংহাসন দখলে ব্যর্থ হলেন তাঁরা বেরিয়ে গেলেন বিশাল সাম্রাজের অন্তর্গত এক একটি প্রদেশের রাজ্যপালের প্রাসাদ ও দূর্গগুলির দখল নিয়ে সম্রাট হতে।

যে ইন্দ্রজালে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেই জালেই তা ভেঙে একাশি টুকরো হয়ে গেল। তাছাড়া, এরপর থেকে এই একাশিটি রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে লেগে রইল নিত্য বিবাদ ও যুদ্ধের যন্ত্রণা।

যে চাষীটি যাদু গামলাটি পেয়েছিল সে এই কাণ্ড দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'গামলাটা আমার কাছে থাকলে আমি কক্ষনো এরকম হতে দিতাম না। ক্ষমতাবানদের হাতে যাদুশক্তি থাকলে যা হয় তাই হল।'

---

*মূল লেখক হুয়াং রুইয়ুন।

রাজকুমারীর ব্যাঙ



এক কালে এক ধনী ছিলেন। তাঁর ছিল ফুটফুটে এক মেয়ে। তিনি তাকে রাশি রাশি খেলনা দিতেন। সব খেলনার মধ্যে রাজকন্যার প্রিয় ছিল একটা মস্ত সোনার বল।

সোনার বল নিয়ে কন্যা যখন তখন লোফালুফি করেন। শূণ্যে ছুঁড়ে রেশমী আঁচল পেতে ধরেন। কখনো বাগানে সোনার বলটা গড়িয়ে পোষা পশমী কুকুর দিয়ে কুড়িয়ে আনেন।

সেদিন দুপুরে কন্যা দীঘির ধারে ছায়ায় বসে সোনার বল নিয়ে খেলছিলেন। হঠাৎই বলটা গিয়ে ঝপাস, করে পড়ল দীঘির বুকে। কন্যা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কেঁদে যখন

হতাশ হয়ে ঘরে ফিরবে, হঠাৎ শুনলে, কে যেন বলল—,

পরীর মতো রূপকন্যে
কাঁদছ তুমি কি জন্যে !

তাকিয়ে দেখেন, কেউ কোথাও নেই। কেবল একটা ব্যাঙ জল থেকে মুখ তুলে আছে। আপন মনেই যেন কন্যা বললেন,—

টলটলে ওই গভীর জলে
হারিয়ে গেছে সোনার বল

অবাক হয়ে কন্যা দেখলেন, এগিয়ে এসে সামনে থেকে ব্যাঙ বলছে,—

খেলনা তোমার আনব তুলে
মোছ তোমার চোখের জল।

কন্যা খুসিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'যদি আমাকে আমার প্রিয় খেলনাটি এনে দিতে পার তাহলে যা চাইবে দেব,—

দেব তোমায় পোশাক দামী
মাথার মুকুট, লকেটটি

ব্যাঙ তাড়াতাড়ি বলল,— ও সব কিছু চাই না আমি,
চাই নে তোমার মুকুটটি।

কন্যা বলল, তাহলে তোমার কি চাই ? ব্যাঙ বলল, চাই, তোমার ভালবাসা। ব্যাঙকে ভালবাসা ? অসম্ভব। কন্যা মনে মনে বললেন। ব্যাঙ বলল,— বন্ধু বলে করবে আমায় আপন

খেলবে, খাবে, থাকবেও একসাথে
আমায় নিয়ে করবে জীপন যাপন
ঘুম পাড়াবে তোমার বিছানাতে

কন্যা মুখ কুঁচকে বললেন,— ম্যা:গো, কি কথার ছিরি
ঘেন্নায় গা করে রি রি !

ব্যাঙ বলল, তাহলে আমি যাই।

কন্যা দেখল, ভারি ঝামেলা হল তো ! সোনার খেলনাটা ব্যাঙের সাহায্য ছাড়া ফিরে পাওয়া যাবে না । আগে তো খেলনাটা ও এনে দিক তারপর ওর সর্ত্তের কথা ভেবে দেখা যাবে।

এই রকম ভেবে কন্যা বললেন,— সর্ত্ত নিলাম সব মেনে
সোনার খেলনা দাও এনে ।

শোনামাত্র ব্যাঙ জলে ঝপ করে লাফ দিল। ডুব সাঁতারে নেমে গেল দীঘির গভীরে।

ঝুপ করে একেবারে কন্যার কোলের কাছে এসে পড়ল সেই সোনার গোলা। কন্যা আনন্দে দিশাহারা। বলটা নিয়ে দে ছুট। সোজা প্রাসাদে।

ব্যাঙ থপ থপ করে কন্যার পিছু নিয়েছে ভরাট গলায় বলছে' পালিও না, কন্যা, কথা রাখ, দয়া করে দাঁড়াও, আমাকে সঙ্গে নাও।'

কথায় কান না দিয়ে কন্যা নিজে ঘরে চলে গেছেন।

পরের দিন। পিতা মেয়ের কাছে এসেছেন। দুজনে রাতের আহার সারবেন। টেবিলে ডিনার সাজান রয়েছে।

হঠাৎ কন্যা শুনলেন, কিশোর গলায় কে তাকে ডাকছে। দোর খুলে দেখে, কি ঘেন্না, সেই ব্যাঙটা। চট করে দোর ভেজিয়ে ফিরে এলেন। পিতা বললেন, কি হল, কি দেখে ভয় পেলে ?

কন্যা বললেন, একটা ব্যাঙ।

পিতা রাগ করে বললেন, প্রাসাদে ব্যাঙ ? প্রহরীরা কোথায় ? কন্যা তখন বাবাকে গতকালের ঘটনা খুলে বললেন। তার কথা শেষ হতেই, দরজার বাইরে থেকে শোনা গেল,—

একটু সময় দিন গোহুজুর আমার কথা শোনার
এই কন্যা হারিয়েছিলেন খেলনাটি তার সোনার।
তিনি যখন সর্ত্ত আমার সব নিয়েছেন মেনে
অথৈ জলের গভীর থেকে দিলাম সেটি এনে
এলাম তাঁকে শপথটি তাঁর করিয়ে দিতে স্মরণ
জীবনসাথী করে এখন করুন আমায় বরণ।

পিতা মেয়েকে বললেন, কথা দিলে কথা রাখতে হয়। যাও, দোর খুলে ওকে নিয়ে এস।

ব্যাঙ থপ থপ করে খাবার টেবিলের কাছে এসে লাফিয়ে বসল কন্যার পাশের কুশনে। বলল কন্যা, তোমার ডিশখানা নামিয়ে আন যাতে আমরা একসাথে খেতে পারি।

ঘেন্নায় কন্যার গা গুলিয়ে গেল। পিতা বললেন, শপথ ভাঙ্গতে নেই। ব্যাঙ যেমন বলছে কর।

নিরুপায় কন্যা খাবার থালা নামিয়ে ব্যাঙের মুখে ধরলেন। ব্যাঙ মহানন্দে লম্বা আঠালো জিভ বার করে ভাল ভাল খাবার টেনে গিলে নিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে বলছে, তুমি খাও। খাচ্ছ না কেন ?

ভরপেট খাওয়া শেষ করে ব্যাঙ বলল, বসতে পারছিনা। প্রথম দিন কিনা। বিছানায় যাই শুয়ে পড়ি। তুমিও দেরি কোর না।

পিতা কন্যাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন, প্রয়োজনের সময় যার উপকার নিয়েছ তার ইচ্ছা অশোভন হলেও ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কন্যা এল কোজাগরী পূর্ণিমায় সাগরের মতো নরম বিছানায়, যেখানে ঘুমিয়েছে একটা কালো কুচ্ছিত কোলা ব্যাঙ।

ভোর হোল। বিছানার এক পাশে জড়সড় হয়ে, একবারও পাশ না ফিরে কখন ঘুমিয়ে গেছেন কন্যা। চোখে গোলাপ পাপড়ির মতো আলোর ছোঁয়া লাগতে, ধড়ফর করে কন্যা যেন কি দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসলেন।

বিছানায় এ কে ঘুমিয়ে আছেন ? ব্যাঙ কোথায় ? এ যে এক কিশোর !

চোখাচোখি হতে কন্যা বললেন, তুমি কে ? ফুলের মতো হেসে কিশোর বললেন, আমিই সেই ব্যাঙ।

অবিশ্বাসী চোখে কন্যা বললেন, ধ্যেৎ! ব্যাঙ কি করে মানুষ হবে ?

কিশোর বলল. ভালবাসায় ব্যাঙও মানুষ হয়।

শিয়ালের চোখ



মোরগ যতবার ছানা বিয়োয় ততবারই শিয়ালের পেটে চলে যায়। মুরগী আবার মা হতে যাচ্ছে। শিয়াল ঘুরছে আশ পাশে। শিয়ালের চোখে লোভ আর হিংস্রতা ফেটে পড়ছে। ওই চোখের দিকে মুরগী তাকাতে পারে না।

মুরগী জঙ্গলের মাতব্বরদের কাছে প্রতিকার চাইতে এল। বাঘকে বলল, 'প্রভু, শিয়ালের হাত থেকে আমার বাচ্চাদের বাঁচান। ওর চোখে কি ভীষণ দৃষ্টি!'

বাঘ গাঁক গাঁক করে বলল—শিয়াল আমার বন্ধু। ওর চোখে বিনয় , সেবা, আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নেই। মুরগী হায়েনার কাছে গেল। বলল, 'হুজুর শিয়াল আমাকে মা থাকতে দেয় না। সব ছানা খেয়ে নেয়। ওর চোখে আমি তাকাতে পারি না।'

হায়েনা বলল,—যত বাজে কথা। শিয়াল অতি ভদ্র জন। আমাকে সর্বদা শিকার ধরতে সাহায্য করে। ওর নামে বদনাম করলে ভাল হবে না বলছি।

মুরগী তখন সিংহের কাছে গেল। সিংহ বললেন, 'শিয়ালের নামে নালিশ, তোমার সাহস তো কম নয়! জান এর পরিণাম কি?'

মুরগী হতাশ হয়ে ফিরে এল। বুঝল, সেয়ানে সেয়ানে থাকে কোলাকুলি, দুর্বলের সেখানে নালিশ জানাতে যাওয়াটাই বোকামি।

নীল নদী লাল পাহাড়



